এই লেখাটি "দ্য ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট" এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কেসহিষ্ট্রি ঃ শুচি-বায়ু (OCD)

সুশান্ত

তখন আমি খুব ছোট। এত ছোট যে সে সময়ের কথা খুব একটা মনে করতেও পারি না। তবে একটি ভীতিকর 'মুখ' এখনও মনে করতে পারি-সেটি আমার 'বড় চাচীর' মুখ। তাকে কখনও হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চাচীর বর্ণনাটা এই রকমঃগ্রাম্য মহিলা, জীর্ণ-শীর্ণ; রোগা; যেন সর্বক্ষণ বিষণ্ন, বিরক্ত এবং কপাল কুচকানো। এটা অবশ্য বাইরের বর্ণনা, কেননা ভেতরটা বুঝার মত বয়স তখনও হয়নি আমার। আর বুঝতে শেখার আগেই চাচী চাচাকে ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন- কে জানে, সমাজ-সংসারের উপর উনি বিরক্ত ছিলেন কিনা? আমি তখন ছোট, আমার জগৎটাও ছোট। মূলত খেলাধুলা আর খেলার সাথীদের সাথে হৈ-চৈ নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। বাড়ির আঙ্গিনা, আমগাছ, পেয়ারা গাছ, ঘরের চাল, পুকুরের ঢাল এসবই তখন আমার খেলার মাঠ। এসব খেলার মাঠে আমার অবারিত আনাগোনার পথে আমার অন্যতম বাধা-কপাল কুচকানো চাচীর 'সতর্ক চাহনি'। বাড়ির আঙ্গিনাই হোক আর গাছের ডালই হোক সেখানে মজা করার আগে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিতাম সেখানে চাচীর উপস্থিতি আছে কিনা। আমার মনে আছে, এই চাচী গলায় পড়তেন রূপাল মালা বা Chain বা রূপার মালার মত কিছু-যা আমার আজন্ম ঘৃণার বস্তু। আজন্ম বলছি এই জন্যে যে আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমার মা-বোনরাও আমার সামনে 'রূপার মালা' পড়তেন না- যদিওগ্রাম্য জীবনে ওটাই ছিল একটা প্রচলিত সাজ। আজও আমি 'আয়রন' কালারের চেইন, শিকল বা ঐ জাতীয় কিছুকে ঘৃণা না করে পারি না। নিকট আত্মীয়, ভাবীরা ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ঠাট্টা করত- যা অনেক সময় আমাকে দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় ফেলত। ব্যাপারটা সবাই জানত এবং সবাই এটাকে 'ছেলে-মানুষী' ধরে নিয়ে মজা করত। এখন বুঝতে পারছি এটাই ছিল আমার 'শুচি-বাই' বা ঊদ্ভ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। কে জানে এর সাথে বড় চাচীর সেই রুদ্র মূর্তির সম্পর্ক আছে কিনা? সেই সময় বাবা ছিলেন কড়া প্রকৃতির। গোটা সংসারটাকেই তিনি নিজ নিয়মকানুনের শাসনাধীন করে রাখতেন। আবার সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রতি তিনি ছিলেন একেবারেই উদাসীন। আমার ধারণা, বাবা-মায়ের ঝগড়া-ঝাটির সূত্রপাত এখান থেকেই। কারণ যাই থাকুক না কেন, বাবা মায়ের উত্তপ্ত সম্পর্ক আমার ছেলেবেলার মধুরদিন গুলোকে মাঝেমাঝেই বিষময় করে তুলতো। সংসারের প্রতি আমার উদাসীনতাও লক্ষ্য করার মত। যা আমার স্ত্রীর কথায় মাঝে-মাঝে টের পাই। আমার এই উদাসীনতা আমার সংসারেও অশান্তির ঢেউ তুলে। তবে কি আমার চরিত্রে বাবার বৈশিষ্ট্যের ধারাবহিকতাই প্রকট হয়ে আছে? আমার এই শুচিবাই সমস্যার আদি কারণ খুজতে গিয়ে আমি মনের অজান্তে বাবা-মায়ের সেই বিষম সম্পর্ককেও দায়ী করি। মজার ব্যাপার হল সেই বাবা-মায়ের সম্পর্ক এখন খুবই সুন্দর, সুষম ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে বাবা এখন আর কঠিন স্বভাবের নেই এখন তিনি নরম প্রকৃতির ও শান্ত স্বভারের এবং খুবই যত্নশীল।

প্রাইমারী পেরিয়ে হাইস্কুলের আঙ্গিনায় এসেই আর্থিক অভাব-অনটনের ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। দেখলাম আমি আমার সমবয়সী বন্ধুদের তুলনায় অনেক বেশি আদেশ-নিষেধের দ্বারা শৃখলিত। পিতার আদেশ নিষেধ ও শাসন-বৃত্তের মধ্যেই আমার কর্মকান্ড আবর্তিত হতে বাধ্য ছিল।

এরপর কলেজ জীবন। ভালো রেজাল্ট করে ভর্তি হলাম ঢাকার একটি বিখ্যাত কলেজে। গ্রাম থেকে সোজা ঢাকা শহরে। এক জগৎ থেকে আরেক জগৎ। একদিকে পুরোপুরি স্বাধীনতা পাওয়ার পরমানন্দ আরেকদিকে ঢাকা শহরের চাকচিক্যময় জীবনধারা – এই দুয়ের টানে আমি কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়লাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে, সভা হচ্ছে, অথচ আমি সেখানে শ্রোতা বা দর্শক হিসেবে নেই, এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না। ফলে যা হবার তাই হলো। পড়ালেখায় ভালো করতে পারলাম না। আবার ভর্তি হলাম ঢাকাতেই। নিশ্চিত চাকুরীর আশায় একটি Technical Graduation Course-এ ভর্তি হলাম। আমার হোস্টেল জীবন। আবার অবধারিত খরচের পালা, যার যোগান দিতে হিমসিম খেতে হয় বাবা-মাকে। আমার পড়ালেখা ঠিক রেখে আমিই বা কি করতে পারি? টিউশানি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু টিউশানীর বাজার সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। এর জন্যে চাই চ্যানেল এবং চাপাবাজি। আমার শিক্ষা কোর্স ৪ বৎসর হলেও সেশন জটের কারণে তা পার হতে প্রায় ৭ বৎসর লেগে গেল। এর মাঝে পড়ালেখা শেষ না করে একবার 'জাপান' যাওয়ার চেষ্টা করে প্রায় ৪০ হাজার টাকা গচ্চা দিয়ে আরও অসহায় হয়ে পড়লাম। শিক্ষা জীবনেও ১ বৎসর গচ্চা গেল। আবার ফিলে এলাম পড়ালেখায়। এবার জীবন আরও কঠিন হয়ে এলো। পারত: পক্ষে বাড়ি থেকে টাকা আনিনা। টিউশানী করি আর পড়ালেখা করি। আর সব সময় ভাবি এভাবে আর কতদিন? কখন কিভাবে কি করলে এর অবসান ঘটানো যায়? কিভাবে দুর ও নিকট আত্মীয়দের টেনে তুলা যায়? পড়ালেখা শেষ না করে এ চিন্তা করা সময়োচিত ছিল না। আমিও বুঝতাম এই

অনুচিত চিন্তা করে পরিবারের কোন লাভ হচ্ছে না বরং সব কিছুই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তবু অর্থ উপার্জনের তাগিদ আমাকে সব সময় তাড়া করে বেড়াতো। পড়াকালীন সময়ে আমি প্রচন্ড 'মাথাব্যথায়' ভূগতে থাকি। পরীক্ষার সময় তা আরও প্রকট হয়ে উঠে। ডাক্তারী পরীক্ষায় কোন রোগ ধরা পরেনা। আবার মেডিসিন খেয়েও কোন কাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত দেশের একজন সেরা মানসিক রোগের ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট নেই এবং দীর্ঘ দিন পর সুস্থ হতে থাকি। ডাক্তারের কথায় মনে হচ্ছিল পারিবারিক-আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সৃষ্ট 'দুশ্চিন্তাই' এর মূল কারণ। অর্থাৎ কারণটা সম্পূর্ণ মানসিক। এখন এটা আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেই সময় যে ঔষধগুলো আমি বেশি খেয়েছিলাম তার নাম Nortnlen & Stemitil. এ দুটো ঔষধের ভূমিকা কি তা আমি জানিনা। তবে আমার ক্ষেত্রে যা ঘটত তাহলো নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম। সে ঘুম যেন আর শেষ হবার নয়। পাশ করার পর চাকুরী পেলাম। সংসারের হাল ধরলাম। এসময় অবধি শুচিবাই এর নূতন কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে ছেলে বেলার লক্ষণগুলি বলবৎ ছিল যা স্বাভাবিক জীবনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এ সময় পেশাগত কারণে আমি বিভিন্ন 'রং' এর সংস্পর্শে আসি। তাত্ত্বিক পড়ালেখার মাধ্যমে রং এর বিভিন্ন সর্বনাশা ক্ষতিকর ক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হই। এবং রং এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকি। ব্যাপারটি রং এর মধ্যেই সীমিত রইলনা, যে কোন রং বা রঙ্গীন দ্রব্য বা রঙ্গীন খাবার এক এক করে আমার নিকট আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাড়ালো। এ সময় আরেকটি ব্যাপার ঘটল। বাসায় বা অফিসে তালা লাগানোর পর তা নিশ্চিত হবার জন্যে তা বার বার চেক করতাম। শেষের দিকে শুধু চেক করলেই হতোনা, রীতিমত তালা লাগানোর ব্যাপারটি কাগজে লিখে পকেটে রাখতাম। এরপর আরও খারাপ অবস্থা– ২/১ বার লিখলে হতোনা, অন্ততঃ ৩ বার লিখতে হতো। এরপর নিত্যনূতন নিয়মে লেখা শুরু করলাম। কিন্তু কোন কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারতাম না। রং এর ভীতিটা (বিশেষ করে কালো রং এর ক্ষেত্রে) এতটা পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল যা কালো শপিং ব্যাগে কোন তরিতরকারী আনা হলেও তা অবলীলায় ফেলে দিতাম। কটন কাপড় ধুলে প্রথম ২/১ দিন রং বের হয়। তাই সর্বপ্রকার কটন কাপড় ব্যবহার জীবন থেকে বাদ হয়ে গেল। এমনকি গামছা বানাতাম সাদা কাপড় কিনে। 'রঙ্গীন' পানীয় খাওয়া ছেড়ে দিলাম। তবু নিস্তার নেই। সবসময় মনে হত কখন বুঝি ক্যানসার ধরা পড়ে। আর ভাবতাম যদি কোন টেস্ট করে নিশ্চিত হওয়া যেত ক্যানসার হওয়ার মত কিছু হয়েছে কিনা। এর মধ্যে বিয়ের প্রসঙ্গ এসে গেল। বিয়ে হল। রং ভীতি ক্রমশঃ বাড়তে রাগল। নতুন বউ আমার শুচির কারণে সমস্ত সাজ-গোজ পরিত্যাগ করে অনেকটা 'বিধবার বেশ' ধারণ করতে বাধ্য হল। তার সাধের সব রকম 'সুতির শাড়ী' বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল- বিনিময়ে এমন কাপড় আনা হল যা হাজার বার সবান লাগালেও রঙ্গিন পানি বের হবে না। পাত্রী পক্ষ প্রমাদ গুনলেন। এমন রোগের কথাতো কখনও শুনেনি। কিন্তু বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন আর কি করার। আমার স্ত্রী কলেজ শিক্ষিকা। মোটামুটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে। কোন বিকল্প চিন্তা না করে তাঁরা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আমার স্ত্রীর ভাই একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে দিলেন। এই প্রথম শুচি-বায়ুর চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। চিকিৎসা চলল। এছাড়া এ সময়ে সেক্সের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও দেখা দিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ফল পেলাম না।

বিয়ের পরেই সেক্সুয়াল ডিজঅর্ডার। আমার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। গেলাম চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞের নিকট। দামি দামি ঔষধের ফিরিস্তি নিয়ে চলে এলাম। আমার সব কিছু যেন তাল গোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নতুন উপায় খুজতে লাগলাম। এরই এক পর্যায়ে সাইকিয়াট্রির একজন প্রখ্যাত প্রফেসরকে দেখালাম। তিনি ঔষধ দিয়ে তার আরেক সহকর্মী সাইকিয়াট্রিস্টর কাছে পাঠালেন। তিনি ঔষধের পাশাপাশি বিহেভিয়ার থেরাপি করতে বললেন। 'বিহেভিয়রাল থেরাপি' নামের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হলাম। এই থেরাপিতে চিকিৎসকেরও ভাল রকম জড়িত থাকা প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন সময়ের। সেই সময় আমার আছে, কারণ আমি রোগী, কিন্তু ডাক্তারের নেই। তারপর আবার নাম করা ডাক্তার-রোগীর অভাব নেই। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম উনি ডাক্তার ভালো, কিন্তু সময়ের খুব অভাব। সুতরাং, "হেথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে"। ঔষধ চলছে নতুন ডাক্তারের সন্ধানও চলছে। ডাক্তারের সন্ধান পেলাম। অন্য একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলাম। চিকিৎসা চলল। ঔষধ ও বিহেভিয়ার থেরাপির যৌথ প্রয়োগ। এখানে মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেলাম। ডাক্তারও সময় নিয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি বিহেভিয়ার থেরাপির নির্দেশ মেনে চলতে বললেন। ডাক্তার সাহেব যা নির্দেশ দিলেন তা মোটামুটি এরকম, রাস্তা-ঘাটে ধুলাবালি, মাটি-ময়লার অভাব নেই। প্রতিদিন রাস্তা থেকে এসব ধুলামাটি কুড়িয়ে এনে প্যাকেট করে রাখবেন। তারপর যোগ আসনের মতো করে বসে ঐসব রাস্তার ধুলাবালি হাতে পায়ে গালে অর্থাৎ সারা শরীরে মেখে ঝিম মেরে বসে থাকবেন, নিদেন পক্ষে এক/দেড় ঘন্টা। এভাবে দিনে অন্তত ২-৩ বার। এছাড়া প্রায়ই হাট বাজারে যাবেন, ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠবেন ইত্যাদি। দেখলাম এসব করতে গেলে আমার শুচির পাগলামি না চলে গেলেও যে কোন সময় চলে যাবে চাকরিটা। তাই সতর্কতার সাথে থেরাপি করতে লাগলাম। এখানেই আমি দীর্ঘ দিন চিকিৎসা নিয়েছি- প্রায় দীর্ঘ চার বৎসর। এই চার বৎসর শুচিবায়ুর লক্ষণ গুলিতে যেভাবে বির্বতন সাধিত হলো তা নিম্নরূপঃ কাল রং→ যেকোন রং→ রঙ্গিন বস্তু→ কফ-থুথু বা সেঁতসেঁতে জায়গা→ মলমূত্রের ভয়। তবে সব অবস্থায় কিছু কমন সিম্পটম ছিল। যেমনঃ নোংরা কাপড়-চোপড়, সিলভার চেইন, হাঁচি-কাশি, লোকজনের ভীড়, অপরিচ্ছন্ন দরিদ্র মানুষ, ম্যানহোল, সুইপার, ড্রেন ইত্যাদি। অবস্থা

এমন শোচনীয় ছিল যে, আমার সামনে কেউ এসবের নাম উচ্চারণ করলেও আমি অনুভব করতাম 'আমি ঘৃনীত বস্তুগুলোর সংস্পর্শে আসছি'। তারপর শুরু হয়ে যেত ক্রমাগত দুশ্চিন্তা যার আদৌ কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এই চিকিৎসা চলাকালিন সময় 'বাচ্চা' নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। চিকিৎসায় কোন লাভ হচ্ছে না দেখে বাচ্চা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ব্যাপারটা এরকম ঃ একটা বাচ্চা নেওয়ার পর আবার চিকিৎসা নিব এবং খুব সম্ভব সাড়া জীবন চিকিৎসার উপরই চলতে হবে। ধীরে ধীরে ঔষধ বন্ধ করে বাচ্চা নেওয়ার জন্য নাম করা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। আবার নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা। অঢেল খরচ। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেল আমার মধ্যে এক ধরনের জটিলতা দেখা দিয়েছে। ডাক্তার রিপোর্ট ঘাঁটা-ঘাঁটি করে মন্তব্য করলেন যে এমন অদ্ভুত ব্যাপার তিনি কখনো দেখেননি। যার কথা বলছি, এ লাইনে উনিই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং 'বাচ্চা' পাওয়ার ব্যাপারেও হতাশ হলাম। জীবনে যখন এমন দুর্দিন তখন একদিন শুয়ে শুয়ে টিভি দেখার সময় একধরণের আজগুবি চিকিৎসার কথা শুনলাম– ঔষধ ছাড়াই 'কথার দ্বারা' চিকিৎসা। স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশনা কেন্দ্র। ব্যাপারটাকে খুব একটা আমল দিলাম না। নামি-দামী ডাক্তারদের দামী দামী দেশী-বিদেশী ঔষুধ খেয়ে যেখানে কাজ হচ্ছে না সেখানে 'কথার চিকিৎসায়' কি কাজ হবে? মনে হল আমি আর কোন দিন সুস্থ হবনা। ভবিষ্যতের অনাগত দুর্দশার কথা চিন্তা করে শিউড়ে উঠতাম। বাবা-মা, ভাই-বোন, নিকট আত্মীয়দের মুখচ্ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠত। মাঝে মাঝে শুয়ে শুয়ে কাঁদতাম। বাবা-মা জানলে এই বয়সে এই শোক তাঁরা সইতে পারবেননা, তাই তাঁদেরকে খুব একটা জানতে দিতাম না। মাঝে মাঝে মনের পর্দায় নিজ জীবনের পরবর্তী দৃশ্যগুলো যেভাবে ভেসে উঠতঃ পাগলামী বাড়তে থাকবে- চাকুরী চলে যাবে- লোকজন জানবে যে আমি পাগল হয়ে গেছি। হয়তো বা বৌটাও একসময় চলে যাবে- বাড়ী, ভাই-বোন সবাই পর হয়ে যাবে। এক সময় আমি সত্যি সত্যিই বদ্ধ পাগলের মত রাস্তায় 'ল্যাংটু' পাগল হয়ে ঘুড়ে বেড়াব। অথবা অবজ্ঞা, অবহেলায় আর শুচির যন্ত্রণায় হয়তো মনের অজান্তে সর্বনাশা কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পরলোকে পাড়ি দিব। যদি মরণটা ঠিক মত না হয় তাহলে তো পরকালও গেল। ব্যাপারটা এমন দাড়াল, যে তখন বাঁচার স্বপ্ন দূরে থাক, যাতে আত্মহত্যা করে মরতে না হয় তার জন্য সাহায্য চাইতাম।

ছোট বেলা থেকেই আমি স্বপ্ন বিলাসী। বিশ্বাস করিতাম- "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন"। অনেকটা 'শেষ' চেষ্টা হিসাবে ঔষধবিহীন কথার চিকিৎসার জন্য ছাত্র নির্দেশনা কেন্দ্রে গেলাম। দেখলাম চিকিৎসকদের ঠাঁয় ঠিকানা পাওয়া আর এক এ্যাডভেন্চার। যাই হোক, যে কোন এ্যাডভেনচার মোকাবেলা করার জন্য আমি মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জানা অজানা চ্যানেল ধরে আমার সেই "কথা- চিকিৎসকদের" খুজতে লাগলাম। দেখলাম খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই তাদের খবর রাখে না। কেউ কেউ মনে হয় আমার নিকট থেকে এই প্রথম শুনল। যাই হোক প্রায় একটানা দুই-তিন মাস চেষ্টার পর বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে 'কথা-চিকিৎসা' পাওয়ার সুযোগ পেলাম। এতদিনে জেনে গেছি ওঁনারা হলেন 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট।' আর চিকিৎসা পদ্ধতির নাম 'সাইকোথেরাপি'। সাইকোথেরাপি দেয় এরকম কোন মানসিক রোগের ডাক্তার সত্যি সত্যি আছেন কিনা তার গবেষণা করে পেলাম অন্য একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে। তিনি একই ধরনের ঔষধ দিলেন। তাকে জানালাম ঔষধ ভীতির কথা। উনি ঔষধ চালিয়ে যেতে বললেন এবং এই বলে সাহস দিলেন যে কোন অসুবিধা হবে না। অন্যদের তুলনায় তার কনফিডেন্স অনেক বেশী। আমি ও কিছুটা ভরসা পেলাম। তাছাড়া আমার তো আর কিছু করার নেই। অবশ্য ম্যাডাম আমাকে সাইকোথেরাপি দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। আশায় আশায় লেগে রইলাম। ইতি মধ্যে প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের বিনা ঔষধের চিকিৎসা নেওয়া শুরু করেছি। প্রথম একজন প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চললো। পরে উনি ঢাকার বাইরে চলে যাওয়ায় অন্য একজনের তত্ত্বাবধানে আমার চিকিৎসা শুরু হলো। থেরাপির প্রথম সেশন শুরু হল ১৮-০২-০২ তারিখে। দুই-তিন সেশনের পর আমার মনে হল "এই সেই যে চিকিৎসার জন্য আমি এত দিন উদগ্রীব ছিলাম, OCD-র বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হল। আমি এক এক করে সাইকোলজিস্ট এর শিখানো টেকনিক, Thought চ্যালেঞ্জ প্রয়োগ করতে লাগলাম। অবিশ্বাস্য রকম সফলতা পেলাম। জীবন স্বাভাবিক হতে শুরু করল। এর আগে রাস্তায় বের হলে আমার সামনে পিছনে দুইজন লোক থাকত আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। তারপরও বাসায় গিয়ে রাতভর গোসল, বাসা শুদ্ধ সব কাপড়-চোপড় ধোয়া, রাতের পর রাত বাথরুমে কাটানো – এসব ছিল নিত্য দিনের ঘটনা।

কয়েক সেশন পড়েই আমি একা রাস্তায় বের হলাম। এখনো চিকিৎসা চলছে। তবে এখন আমি ৯০% সুস্থ। এখন একাই চলাফেরা করি, কোন অসুবিধা হয়না।

আমি নিজেই এখন নিজের ডাক্তার ও থেরাপিষ্ট। নিজেকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার যাদু-মন্ত্র এখন আমার হাতের মুঠোয়। শুধু শুচি-বায়ু বা OCD -কে জয় করা নয়-অযাচিত ও বিরক্তিকর যে কোন বাধা ও সমস্যাকেই এখন আমি সাইকোথেরাপির দ্বারা প্রত্যহ প্রতিহত করছি এবং প্রতিক্ষেত্রেই দারুণভাবে সফল হচ্ছি। মাঝে-মাঝে মনে হয় যদি এভাবে আগাতে পারি আর দুর্ভাগ্যক্রমে দুরারোগ্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত না হই বা কোন মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার না হই তবে অদূর ভবিষ্যতেই আমি 'সাধারণ' থেকে অনেকটা অসাধারণের স্তরে পৌছে যাব। এখন আমি প্রায়ই বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করি– সত্যিই সে এক পরমানন্দ।

আমার ধারণা সাইকোথেরাপির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা বদ-অভ্যাস, মুদ্রাদোষ ও সিদ্ধান্তহীনতা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করা যাবে। সিদ্ধান্তহীনতা, দোদুল্যমনতা জীবনে অনেক বড় বিপর্যয় ঘটায়। জীবনকে সুন্দর-শান্তিময় ও শানিত করার জন্য যে সব চারিত্রিক উপাদান থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমকালীন অবস্থার সাথে খাপখাওয়ানো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বাধাকে অতিক্রম করা যার জন্যে প্রয়োজন দৃঢ় মানসিক শক্তি এবং যৌক্তিক অবস্থান-এ দুটি গুণই সাইকোথেরাপির 'অনন্য সৃষ্টি'।

আমার মনে হয় সকল মানসিক সমস্যার সমাধান চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের একক সাধ্যের মধ্যে নেই- এটা ঠিক। আবার মানসিক সমস্যার 'সম্পূর্ণ সমাধান' এবং ভবিষ্যতের Repeatation ঠেকানোর জন্য ঔষধের পাশাপাশি সাইকোথেরাপির বিকল্প নেই।

এখনও আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এর নিকট যাই। সাথে সাথে আমার সাইকোথেরাপি নেওয়াও চালিয়ে যাচ্ছি।

Psychotherapy আমার জীবনে কল্পকাহিনীর রূপার কাঠি, জিয়ন কাঠির মত। থেরাপিষ্টের নির্দেশমত থেরাপির টেকনিক অনুসরণ করতে পারলে যে কোন মানুষই তার 'ঘুমন্ত শক্তি' বা Positive force-কে জাগ্রত করে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ্য করতে পারেন।

পরিশেষে বলতে চাই, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে ডাক্তারি চিকিৎসার পাশাপাশি Clinical Psychology-র প্রচার, প্রসার ও প্রয়োগ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হওয়া জরুরী।

লেখকের নাম ও পরিচিতি

বর্তমান লেখাটির লেখক সুশান্ত (এটি উনার প্রকৃত নাম নয়) একজন ছাত্র। উনি দীর্ঘদিন 'অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅরডার বা শুচিবায়ু" নামক এক ধরণের মানসিক সমস্যায় কষ্ট পেয়েছেন। বর্তমান লেখায় তিনি নিজের কষ্টের কথা এবং কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুজে পেলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তার লেখার থেকে কোন পাঠক উপকৃত হলে তিনি নিজেকে স্বার্থক মনে করবেন।

সম্পাদকের নোট

এ লেখায় লেখক স্বতস্ফূর্ত ভাবে তার মনের কথা তুলে ধরেছেন। লেখাটি ঠিক পেশাদারী লেখা নয়। একটি এক ধরণের আত্মকাহিনী। 'দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী লেখকের হুবহু লেখাটি প্রকাশ করলেন।